দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 DEC 1986
পৃষ্ঠা 4 কলম 4

95

পাঠ্যপুস্তক

এ সম্পর্কে অবহিত থাকেন না অনেক সময়। কিংবা হয়ততেমন গুরুত্ব দেন না। আরও একটি উদাহরণ দেই আমাদের যুক্তির সপক্ষে। গাছের পাতার বহু প্রতি শব্দ রয়েছে। যেমন, পত্র, পল্লব, পর্ণ। কিন্তু বিজ্ঞান বইয়ে শুধু 'পত্র' লেখাই বাঞ্ছনীয়। পাতাও নয়, পল্লবও নয়। এভাবে বাইনারী ষ্টার-এর ক্ষেত্রে যুগ্ম নক্ষত্র ব্যবহার বান্ছনীয়। জোড়া তারা বা জোড়া তারকা শব্দ ব্যবহারে আপত্তি নেই। রচনাশৈলীর জন্য কেউ হয়তো বলবেন যে, লেখকের স্বকীয়তার স্বার্থে কেন এই পছন্দ-অপছন্দথাকবে না। বিশেষভাবে একটি সুন্দর লেখার জন্য তো উপযুক্ত শব্দ চয়ন এর প্রতি যত্নবান হতে হয়। আমার প্রশ্ন হল বিজ্ঞান বই পাঠ্য এবং মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে একটি নিয়ম মেনে চলা উচিত। কিন্তু বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখাগুলোতে কিছুটা স্বাধীনতা আছে নিজস্ব পছন্দ এবং অপছন্দ সম্পর্কে। সেখানে জোড়া তারা লিখলেও কিশোর পাঠ করা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গল্প, কাহিনী, জীবনী দ্রুত আয়ত্ত করতে পারবে।

বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখা কী রকম হওয়া উচিত তার সম্পর্কে আমার ভাল জ্ঞান নেই, তবে একটা ধারণা আছে হয়তো অস্পষ্ট, হয়তো অপূর্ণ। সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে বিজ্ঞান লেখকগণ বিশেষভাবে পাঠ্যপুস্তক এবং মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে এটুকু মেনে নিবেন যে, এ ধরনের বই পুস্তকে একটি মান অনুসরণ করা ভাল।

বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পরিভাষা নেই বলে দুঃখ করি অনেক সময়। বাংলাতে বিজ্ঞানের মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে আমাদের আগ্রহ এবং উদ্যম এই অভাব দূর করতে পারে। সাথে সাথে একথাও স্বীকার করতে হবে শব্দের জাত বিচার নিয়ে রাজনৈতিক কারণে দ্বন্দ্বকলহ আমাদের বিজ্ঞান চিন্তাকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষার দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান গ্রন্থে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাই যেমন অনেকের কুণ্ঠা আছে, তেমনি, অলৌকিকত্ব আরোপের প্রতিও ঝোঁক রয়েছে। বিজ্ঞান অধিবিদ্যার আধিপত্য স্বীকার করে না।

সেদিন বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে ডঃ হারুন অর রশীদ 'দৃষ্টবাদ এবং প্রতিদৃষ্টবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যৌক্তিক দৃষ্টবাদের অবদান সম্পর্কে এই কথাটাই বলেছেন। অবশ্যই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য এই বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

আমি সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বই "সাধারণ বিজ্ঞান" সম্পর্কে এই আলোচনার ক্ষেত্রে ভালভাবেই অবহিত রয়েছি যে, এই পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং পণ্ডিত। দেশের সার্বিক অবস্থা এবং সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে সচেতন।

তাই, আমার আলোচনায় একজন সাধারণ অভিভাবক হিসাবে তথা নাগরিক হিসাবে যে সব অসুবিধাগুলো রয়েছে এবং শিক্ষাদান ক্ষেত্রে দুর্বলতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা তারই নিরিখে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা মত তুলে ধরেছি।

তারপরও একটা কথা থাকে। এই পুস্তকের রচনা ও সম্পাদনায় গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিদের সমাবেশ সত্ত্বেও একজন বিদেশী উপদেষ্টার প্রয়োজন পড়েছে। জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বিদেশীর উপস্থিতিকে আমি এলার্জিক মনে করি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্যিই কি তার প্রয়োজন ছিল? না এর পিছনে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আছে।

সাধারণ নাগরিকরা এ ব্যাপারে অবহিত নন যে, এদেশে নীচের শ্রেণীর গণিত বই লেখেন একডজনের কাছাকাছি গণিতজ্ঞ ব্যক্তি। এবং তাদের লেখা বাংলা গণিত পুস্তকটি তারপর ইংরাজীতে অনুবাদ হয়। একজন ইংরেজী ভাষা পণ্ডিত তা দেখে দেন। অতঃপর তার নির্দেশও পরিমার্জনাশেষে পুনরায় তা বাংলায় প্রকাশ করা হয়। একটি বিজ্ঞান সম্মেলনে একজন বক্তা দু' বছর আগে এই তথ্য ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেছিলেন। এখানেও কি ব্যাপারটা সেরকম কিছু কিনা---এরকম একটা সন্দেহ মনে উঁকিঝুঁকি মারে। বৃটিশ আমলে গণিত বিষয়ক পুস্তকগুলো এদেশীয় গণিতজ্ঞরা লিখেছেন। তার ভাগ্যে এই ভাষান্তর আর উপদেষ্টার প্রসাধন নিয়ে কোন বই প্রকাশিত হয়নি। আমাদের এই বিপুল আয়োজন কি জ্ঞানের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য না এর পিছনে গূঢ় কোন কারণ আছে, তা জানতে পারলে ভাল হত। অবশ্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পিছনে যুক্তির অভাব হয় না। আমি শুধু জানতে চাই পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিদেশীদের উপদেশ কেন অপরিহার্য।

কথায় আছে, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। আমাদের হয়েছে সেই দশা। বেশ কিছুদিন আগে উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প পরিচালকদের সম্মেলনে সরকারের পক্ষ থেকেই বিলাপ ধ্বনি শোনা গেছে যে, প্রাপ্ত সাহায্যের ৫০ শতাংশ বিদেশী পরামর্শ দাতা (বিশেষজ্ঞ)দের পিছনে ব্যয় হয়। এর যে অনেকটা অপ্রয়োজনীয় সেদিন সে কথাটা তারাই বলেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের পরামর্শ দাতাদের উপস্থিতির কারণ কি একই? এ প্রশ্নের সদুত্তর কার কাছে চাইব?

বিজ্ঞানের ভাষা সমস্যার আলোকে

অনিরুদ্ধ

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই কম। মৌলিক বিজ্ঞানের বই তো খুবই কম। তাছাড়া স্কুলপাঠ্য বই এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যে, সেখানে অনেক জিজ্ঞাসার জবাব বইয়ের পাঠ্য অংশ থেকে উদ্ধার করা যায় না। কোন কোন বিষয় সমগ্র বইয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধরা যাক, বাতাসে কী পরিমাণ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বনডাই-অক্সাইড রয়েছে তা সপ্তম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য বিজ্ঞান বইয়ে নেই। নেই কথাটা অবশ্য সর্বাংশে সত্য নয়। বইয়ের ২৮ পৃষ্ঠায় 'কার্বনডাই-অক্সাইডের ধর্ম ও ব্যবহার' শীর্ষক উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাতাসে এই গ্যাসের পরিমাণ ০'০৩%। বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে অক্সিজেনের ধর্ম ও বিভিন্ন ব্যবহার আছে। আছে পরীক্ষাশেষে উপনীত সিদ্ধান্তের সারাংশ। প্রথমদিকে শুধু বলা হয়েছে বাতাসে প্রচুর অক্সিজেন রয়েছে। অন্যান্য গ্যাসের তুলনায় কী পরিমাণ তার উল্লেখ নেই। অথচ অনুশীলনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জানতে চাওয়া হয়েছে বাতাসের মোট আয়তনের ৭৯% অক্সিজেন-এটা সত্য, না মিথ্যা। বইয়ের বিভিন্ন স্থানে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্ররা কী পড়েছে বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে তা দেখে নিতে বলা হয়েছে। হয়তো সেখানে বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ উল্লেখ রয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বইটি হাতের কাছে নেই। তাই নিশ্চিত হতে পারিনি।

এসব কথা উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, আমাদের দেশে সমাজসচেতন শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা মিলে স্কুল পাঠ্যবইটি সম্পাদনা করেছেন। তারা শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার মান, স্কুল-কলেজে পড়ানোর রীতিনীতির সাথে পরিচিত। সমস্যাগুলো তারা জানেন। আর ছাত্রদের উদ্যোগী করার জন্য তাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিজ্ঞান বই রচনার যে ধারা অবলম্বন করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলেছেন, কোন স্কুলে যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে কিনা তার খোঁজ রাখেননি। তারা ভালভাবেই জানেন সকল সরকারী স্কুলেও ছাত্রদের হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নেই। শিক্ষকরাও এ ব্যাপারে উদাসীন।

আমি বিজ্ঞান বই রচনা বা সম্পাদনার ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি নেওয়া উচিত তা বলছি না। আমি সমস্যার কথা বলছি। আর এসব সমস্যা আমার চেয়ে পাঠ্য বিজ্ঞান বই রচয়িতারা বেশী জানেন। তারা হয়তো বলবেন যে, কীভাবে এবং কোন্ প্রণালী তথা পদ্ধতি রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে তা স্থির করার এখতিয়ার তাদের উপর নয়, স্কুল শিক্ষা বোর্ড এবং টেক্সটবুক বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। তাদের বক্তব্য বা যুক্তি খণ্ডন না করেও বলা চলে এ ধরনের পদ্ধতি কি আমাদের ছাত্রদের বিজ্ঞান বিষয়ে খুব বেশী উৎসাহিত করতে পারছে? কিংবা ক্লাসে বিজ্ঞান শিক্ষার পঠন-পাঠনের ধারা উন্নত করতে সাহায্য করছে?

বিষয়টির প্রতি শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী এবং স্কুল শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতানুগতিক ধারায় যেমন বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি হয় না, তেমনি শুধুমাত্র শিক্ষাদান ব্যবস্থা এবং বইকে তদুপযোগী করে রচনার মধ্যে সম্পর্কহীনতাও অভীষ্ট ফল অর্জনে সহায়ক হতে পারে না।

অনেক ক্ষেত্রে প্রদত্ত অনুশীলনীর জবাব বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একটা সত্য/মিথ্যা নির্ণয়ের উদাহরণ আগেই উল্লেখ করেছি। একই অনুশীলনে (পৃঃ ৯) আছে "যে দুটো গ্যাসের পরিমাণ বাতাসে সবচেয়ে বেশী তাদের মধ্যে একটি অক্সিজেন, অন্যটি--" এই শূন্য স্থান পূরণের জবাবটি নিঃসন্দেহে নাইট্রোজেন। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে গ্যাস তৈরির ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের নাম উল্লেখ ছাড়া তার পরিমাণ সম্পর্কে কোন আভাস দেওয়া হয়নি। সম্ভবতঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বই-এ আছে।

এই নতুন ধরনের পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী ছাত্রদের পড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অভিমত -জরিপ করা প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয়ের জন্য জরিপ। এটা অবশ্য আমি মনে করি। শিক্ষাবিদরাই শেষ রায় দিতে পারেন, এ ধরনের জরিপ প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয়।

আমার এ লেখাটার উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল ভিন্নতর। সেদিকেই এই পুস্তক প্রণেতা ও সম্পাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারা যে সমাজসচেতন এবং ছাত্রদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি উন্নততর শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করেছেন, বইয়ে তার স্বাক্ষর আছে বলেই কথাটা বলতে উৎসাহী হয়েছি।

একটি স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞানপত্রের প্রশ্ন ছিল বায়ুমণ্ডল কাকে বলে? উহার ক'টি স্তর ও কি কি? চিত্রসহকারে বিবরণ দাও।

ছাত্রটি প্রশ্নের উত্তরে বায়ুমণ্ডলের তিনটি স্তর উল্লেখ করে লিখল ঘনমণ্ডল, সূক্ষ্মমণ্ডল এবং আয়নমণ্ডল। সাথে ইংরেজী প্রতিশব্দ ট্রাপোস্ফীয়ার, ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার এবং আয়নস্ফীয়ারও দিয়েছে। বইতেই বাংলা শব্দের পাশাপাশি এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। উত্তর শুদ্ধই হয়েছে বলতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল ইংরেজী শব্দত্রয়ের যে বাংলা প্রতিশব্দ বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে তা কী সার্বজনীন। আমরা জানি, একটি বাংলা শব্দের বহু প্রতিশব্দ রয়েছে। রয়েছে অন্যান্য ভাষায়ও। এটা ভাষার সমৃদ্ধতার লক্ষণ। 'সূর্য' এই শব্দটির বহু প্রতিশব্দ রয়েছে; মিহির, দিবাকর, তপন, মার্তণ্ড, দিননাথ ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞান বইয়ে কেউ 'সূর্য' শব্দ ছাড়া অন্য প্রতিশব্দগুলো লিখবেন না। কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বুঝাতে একটি নির্দিষ্ট প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবিষ্কৃত গ্রহ ইউরেনাসের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছিল। আবিষ্কারক জর্জ হার্শেল তৎকালীন ইংল্যাণ্ড রাজ তৃতীয় জর্জের নামে গ্রহটির নাম রাখেন। পরবর্তী সময়ে আবিষ্কারকের নামের সাথে যুক্ত করে গ্রহটির নাম হার্শেল রাখা হয়। তারপর জুপিটার ও স্যাটার্নের নাম যেহেতু গ্রীক পুরাণ থেকে করা হয়েছে, তাই পারম্পর্য রেখে গ্রহটির নামকরণ করা হল ইউরেনাস।

বাংলায় মেডেটারিয়ান সীকে লেখা হয় ভূমধ্যসাগর। রবীন্দ্রনাথ তার কিছু কবিতা যখন ভূমধ্যসাগরে জাহাজে অবস্থানকালে লিখেছিলেন, তার তারিখ ও স্থান উল্লেখকালে লিখেছিলেন মধ্যধরণীসাগর। নামটি কাব্যিক সন্দেহ নেই। কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় এজন্য ভূমধ্যসাগরের স্থানে বিকল্পে নামটি ব্যবহারের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না, যদিও অর্থগতভাবে কোন ভুল হবে না যদি 'মধ্য ধরণী সাগর' লেখা হয়।

ট্রাপোস্ফীয়ারের উচ্চতা স্থানবিশেষে ১৭ কিলোমিটার যেমন বিষুবাঞ্চলে। আবার সুমেরুর কাছে মাত্র ৭ কিলোমিটার, গড়ে ১১ কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরেই বাতাসের ঘনত্ব বেশী। ঝড়ঝঞ্ঝা বায়ুমণ্ডলের এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ে লেখা 'ঘনমণ্ডল' অর্থগতভাবে ভুল না হলেও ক্ষুব্ধমণ্ডল হিসেবেই বাংলা বিজ্ঞান বইয়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার একই কারণে 'স্তব্ধ মণ্ডল' নামে অভিহিত। আর ওই স্তরে বায়ুর ঘনত্ব খুবই হাল্কা বলে বাতাস প্রায় গতিহীন তাই বায়ুমণ্ডলের এই স্তর রেয়ারিফাইড এয়ার (তনুবাত) হেতু স্তব্ধমণ্ডল। আক্ষরিক অর্থে সূক্ষ্মমণ্ডল বোধ হয় অর্থকে স্পষ্ট করে না। কিন্তু সমস্যাটা হল যে ছাত্ররা একই স্থানের দু'ধরনের নাম নিয়ে অসুবিধায় পড়বে। সুতরাং সর্বসম্মত শব্দটিকে তথা প্রচলিত শব্দটিকে গ্রহণ করতে হবে। নামকরণ ও নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটাই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কিন্তু নানা কারণে আমরা নিজস্বতা প্রকাশের জন্য হোক, কিংবা অন্য কোন হেতু হোক এ দিকটার ওপর জোর দিতে চাই না।

অথচ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞানচর্চার সাথে সম্পর্কিত পণ্ডিত ও [illegible]